সূচনাকারী চিঠি

হ্যাকউড, ব্যাসিংস্টোক
১৬ এপ্রিল, ১৯০৮

সুপ্রিয় মি. বাস্টিড,

আপনার 'সেকালের কলিকাতার প্রতিধ্বনি' বইখানির অপর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ সূর্যের আলো দেখতে পাবে শুনে ভারি খুশি হলাম। এই সংস্করণটি প্রকাশের পূর্বেই পড়ার সৌভাগ্য হওয়ায় বলতে পারি, আপনার অসীম জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসার ছাপ এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় বিদ্যমান। ভারতে যাওয়ার পথে এই বইটি প্রথম পড়েছিলাম। তাই এই বইয়ের পাতায় একই সঙ্গে স্মৃতিমেদুরতা ও অনুপ্রেরণা অনুভব করেছি। স্মৃতিমেদুরতার কারণ, এই বইয়ে বাংলায় ব্রিটিশদের আগমনের প্রাথমিক বছরগুলির কথা বহু বিখ্যাত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের জীবন এবং কর্মের সঙ্গে বলা আছে। অনুপ্রেরণার কারণ, আপনার এই অসামান্য লেখনীর মাধ্যমে বর্ণিত সেই অতীতগাথা নিশ্চয়ই আমারই মতো আরও বহু মানুষকে সেই অকুস্থলগুলি দেখতে লোভাতুর করে তুলেছে।

কলকাতা এমনিতে খুবই সাধারণ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হলেও আদতে কিন্তু কলকাতা বিশ্বের সবচেয়ে আগ্রহজনক শহরগুলির মধ্যে একটি। কতিপয় ইউরোপীয়গণ সেখানে কেবলই মুহূর্তের অতিথি ছিলেন এবং কালের গর্ভে তাঁদের বসবাসের ক্ষীণতম অস্তিত্বটুকুও বিলীন হয়ে গিয়েছে বলে এই শহরের প্রতি কৌতূহল তো কমে যায়ই না; বরং যাঁরা তাঁদের গোটা যৌবরাজ্য সেখানে কাটিয়ে পরবর্তী জীবনে আরও উন্নতি করার আশায় অন্যত্র গিয়ে অবসর নিয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবলে কৌতূহল বেড়েই যায়। আপনি যে সময়কালের প্রতি আলোকপাত করেছেন, সেই সময়ের স্মৃতিমন্থন করলে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, স্যার এলাইজ়া ইম্পে, রোজ এলমার, চিত্রশিল্পী জোফানি ও হবু প্রিন্সেস টালেরাঁর মতো বৈচিত্রময়, প্রসিদ্ধ চরিত্রদের উল্লেখ মেলে। অতএব, এই কথা অনস্বীকার্য যে, এই স্থান এবং কাল উভয়ই অতি মূল্যবান স্মৃতি হিসেবে রোমন্থন করার উপযোগী।

আমরা যত অতীত, তার আচার-ব্যবহার থেকে দূরে সরে আসছি, ততই এক দুর্গম খাদ আমাদের প্রপিতামহদের দেখা যুগ থেকে আমাদের আলাদা করে

দিচ্ছে। যতই সেই সময়ের নানা ঘটনা ও চরিত্রদের প্রতি অদম্য কৌতূহল জাগছে, ততই তাঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্বও আমরা অনুভব করতে পারছি। আপনার এই বই যে নতুন জীবনের সন্ধান দেয়, যে ছবির ভিড় আমাদের সামনে তুলে ধরে, তা দেখে মনে হয়, তা যেন এক আলাদা জগতের ছবি। আপনার সঙ্গে আমরা ফের ভারাক্রান্ত মনে অন্ধকূপের বিলাপ শুনি, ওয়ারেন হেস্টিংসের ভালোবাসা খুঁজে পাই, জুনিয়াসের চক্রান্তের কথা জানি, করোমন্ডল উপকূলে জন্মানো এক সুন্দরীর কথা শুনি, যিনি সারা ইউরোপের সবচেয়ে দক্ষ রাজনীতিবিদের প্রেমিকা, তথা স্ত্রী হয়েছিলেন।

তবে, আপনি সবচেয়ে বড়ো যে কাজ করেছেন তা হল, ভারতের আধুনিক প্রজন্মকে বোঝানো যে ব্যাবসা হোক বা শাসন, তাতে তারা যতই ডুবুক না কেন, তার ব্যাপারে গবেষণা করা উচিত। আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থার বীজ যে সময়ে বপন করা হয়েছিল, সেই সময়ের স্মৃতিচারণা তাদের সবার করা উচিত।

আপনার এই নব্য সংস্করণটি পূর্ববর্তী সকল সংস্করণের সঙ্গে পাল্লা দিক, মায় তাদের ছাপিয়ে গিয়ে আরও দিকে-দিকে এই মূল্যবান শিক্ষার বিস্তার করুক; এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ড. বাস্টিড।

আপনার অনুগত,
কার্জন অফ কেডেলস্টন

ভূমিকা

এই বইয়ের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বোঝা যায়, পাঠকমহলে, বিশেষ করে ভারতের পাঠকদের মধ্যে এই বই ছাপ ফেলেছে।

সেই ছাপকে আরও সুদৃঢ় করে তোলার জন্য এই সংস্করণে এমন কিছু জিনিস যোগ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে ছিল না। বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত নানা নতুন তথ্য এই বইয়ে যোগ করে কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তা ছাড়া, আরও স্বাধীনভাবে বইয়ের ছবি যোগ করা হয়েছে। এ-ছাড়া একটি কালপঞ্জির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ভারতের পাঠকদের জন্য ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, তা-ও বলে রাখা ভালো, এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধটি এই বইয়ের মূল আলোচ্য সময়েরও দীর্ঘকাল আগের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে নিয়ে লেখা। কিন্তু, এই বইটির মতো প্রাচীন কলকাতা নিয়ে লেখা বইয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি যখন এই প্রবন্ধটি পরিমার্জনা করছিলাম, তখন মিস্টার এস. সি. হিলের অমূল্য কাজ পাঠের সুযোগ পেয়েছি।

বর্তমান, বা আগামীতে যে বা যারা ১৭৫৬-১৭৫৭ সময়কালের বাংলা বা কলকাতাকে নিয়ে কাজ করতে চাইবে, তাদেরকে তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমের কাজখানা পড়তেই হবে।

গত কয়েক বছর আগেও এই প্রথমদিককার সময়কাল এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলির ব্যাপারে কেউ খুব একটা আগ্রহ দেখাত না; কিন্তু বর্তমানে সে-বিষয়ে আগ্রহ দেখে মনে স্বস্তি জাগে।

সম্প্রতি বহুপ্রত্যাশিত ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির পত্তন হয়েছে। এত বড়ো-বড়ো মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি তৈরি হয়েছে যে তা দেখে বোঝা যায় প্রাচীন সময়ের ব্যাপারে কৌতূহল ক্ষণজীবী হবে না, বরং দিনে-দিনে এই কৌতূহল বাড়বে। কলকাতার (তথা ভারতের) সকল শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশা করতেই পারেন, এই গোষ্ঠী ক্রমে ফুলেফেঁপে উঠবে।

যাঁদের জন্য আমি বেশ কিছু ইঙ্গ-ভারতীয় এবং অন্যান্য বিখ্যাত মানুষের ছবি এই সংস্করণে যোগ করতে পেরেছি, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদার্হ রইলাম। প্রথম ডোয়্যাগার দ্য লেডি নেপিয়ার এবং এট্রিক-কে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এট্রিক তাঁর কাছে থাকা স্যার জন ক্লেভারিং-এর পোর্ট্রেটের শুধু ছবিই তুলতে দেননি, তাঁর বড়ো মেয়ের (পরবর্তীকালে লেডি নেপিয়ার) একটি মিনিয়েচারের ছবি নিজে থেকেই দিয়েছিলেন।

দুঃখের সঙ্গে জানাই, প্রাচীন কলকাতার সেই জেনারেল ক্লেভারিং-এর সহকর্মী মাননীয় কর্নেল জর্জ মনসনের কোনো ছবি লর্ড মনসনের কাছে নেই। তবে তিনি সেই আসল ছবির সঙ্গে মিল আছে, এমন একটি ছবি আমাকে পাঠিয়েছিলেন— তাকে একটি সাদার ওপর কালো ছোপের ছবিই বলা চলে, তা থেকে আমি ছবিটির পুনর্নির্মাণ করেছি। অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা স্যার রবার্ট চেম্বার্সের ছবিটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে ঋণী রয়ে গেলাম। বিশেষ করে, ড. মাকানের কাছে, আমার অনুরোধের পাশাপাশি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে একই ছবির একটি অসাধারণ মেজোটিন্ট খোদাই করা (হাফটোন) ছবি আমাকে দিয়েছেন।

সারের পার্কহার্স্ট নিবাসী আমার বন্ধু কর্নেল লুইনকে ধন্যবাদ, তার পিতামহের কিছু পারিবারিক ছবি আমাকে এই বইতে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য।

সবশেষে বলি, ডব্লিউ. থ্যাকার অ্যান্ড কোং-কে ধন্যবাদ জানাই এত ছবিসমেত এই সংস্করণটি প্রকাশের ঝক্কি পোহানোর জন্য এবং এতগুলো দিন ধরে তাঁদেরই সংস্থা থেকে বইটির একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য। প্রকাশক হিসেবে তাঁদের ক্রম শ্রীবৃদ্ধি হোক, এই কামনা করি।

এইচ. ই. বি.

১৯০৮

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কখনো-কখনো পুরোনো মদকে নতুন বোতলে পেশ করার প্রয়োজন হয়। না, নতুন বোতলে ঢেলে তার গুণমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, বরং যাতে তা ভাঁড়ার থেকে বের করে এনে টেবিলে সবার পাত্রে ঢেলে দিতে সুবিধে হয়।

সে-রকমই এক প্রচেষ্টা এই বইতে করা হয়েছে। সহজ করে বললে বলা যায়, লেখক বহু পুরোনো সূত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সেখান থেকে কলকাতার অতীত এবং তার বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষদের নানা কাহিনি, নানা তথ্যাবলি ঢেলে সাজিয়ে পাঠকদের জন্য পেশ করেছেন।

এখানে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে, সেগুলি এই শহরের ইতিহাসের সঙ্গে চিরতরে জড়িয়ে থাকবে এবং অনুমান করা যায়, ভারতে আগত যে-কোনো মানুষই তা পড়তে চাইবেন, বা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে চাইবেন।

এই বইয়ের সাহিত্যগুণের জন্য লেখক কোনো প্রশংসার দাবিদার নন। এই বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধাবলির মধ্যে অনেকগুলিই বিভিন্ন সময়ে 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের মনে আগ্রহের সঞ্চার করার জন্যই এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। যথাযথ অনুমতিক্রমেই এই লেখাগুলি একত্র করে, সামান্য কিছু রদবদল ঘটিয়ে এই বইয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাদাম গ্র্যান্ড সংক্রান্ত প্রবন্ধটি এই প্রথমবার প্রকাশিত হল। এখানে বলে রাখা ভালো, সেই প্রবন্ধে উক্ত বিখ্যাত বিচারটির বর্ণনা নানা আধিকারিক ও অন্যান্য নথি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা এর আগে কখনও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি।

মিসেস হেস্টিংসের উদ্দেশে লিখিত গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত চিঠির যে অংশগুলি এখানে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিও এই প্রথমবার ছাপার অক্ষরে পরিবেশিত হল।

এইচ. ই. বি.

১৮৮২

অনুবাদকের অল্পকথা

তিলোত্তমা কলকাতা। যত সময় গড়িয়েছে, তত এই প্রাচীন শহরের গায়ে পরতে পরতে জড়িয়েছে ইতিহাস। পত্তনের সময় থেকে একবিংশ দশক— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাক্ষী হয়ে থেকেছে এই প্রাসাদনগরী। সেই ইতিহাস নিয়ে চর্চাও কিছু কম হয় না। দীর্ঘকাল ধরে বহু নামজাদা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকরা কলকাতাকে নিয়ে নানা বই লিখেছেন। সে-সব বইয়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্রও ব্যাপক প্রকৃতির। তবে, কলকাতা সংক্রান্ত বইয়ের আলোচনা করতে গেলে শ্রীপান্থ এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম তো অবশ্যই উঠে আসে। কিন্তু এই বিষয়-বৈচিত্র সম্পন্ন বইগুলির মধ্যেও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বেশিরভাগ বইতেই তৎকালীন কলকাতা কেমন ছিল, বা কলকাতার স্থানীয় মানুষ কেমন ছিল— এই আলোচনা উঠে আসে। ইউরোপীয়দের চোখে কলকাতাও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কলকাতানিবাসী ইউরোপীয়দের ব্যক্তিগত জীবন, সেই সময়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মায় সেই ইউরোপীয়দের নিজেদের দেশে বা অন্য দেশে ঘটানো নানা কীর্তিকলাপের কথা এর আগে এত স্ফীত আকারে বাংলায় লিপিবদ্ধ হয়নি।

পাঠক এই 'অনুবাদকের অল্পকথা' পড়ার আগে মূল লেখকের মুখবন্ধটি পড়তে গিয়েই হয়তো সামান্য ভ্রূ কুঁচকেছেন। বিষয়টা একটু খোলসা করা প্রয়োজন। হেনরি এমস্লে বাস্টিড লিখিত 'ইকোজ় ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তারও আগে লেখক লন্ডনের এবং কলকাতায় এসে কলকাতার মহাফেজখানা ঘেঁটে বহু পুরোনো নথি উদ্ধার করেন; কলকাতার বহু জায়গা নিজে দেখে অনুমান করার চেষ্টা করেন, ঠিক কোথায় অন্ধকূপ ছিল বা হেস্টিংস-ফ্রান্সিস দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঠিক কোথায় ঘটেছিল। তাঁর সেই বিপুল পরিশ্রমের ফসল ছিল এই বইটি। বাগদেবীও তাঁর এই পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হওয়ায় বইটি পাঠকপ্রিয়ও হয়েছিল। ১৯০৮ সালে এই বইটির চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৮৮৮ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৮৯৭ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বাস্টিড নিজেই ১৯১২ সালে পরলোকগমন করায় অনুমান করা যায়, এই চতুর্থ মুদ্রণের পরে আর কোনো পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

প্রকাশিত হয়নি। কাজেই, এই সংস্করণটিকেই প্রামাণ্য ধরে এগোনো হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিকে একেবারে নাকচ করে দেওয়া হয়নি এই বইয়ে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি যোগ করার পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ব্যবহৃত কিছু প্রয়োজনীয় ছবি (যা এই সংস্করণে বাদ পড়েছিল), তা-ও এই বইয়ে উপযুক্তভাবে যোগ করা হয়েছে।

এই বইয়ে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় চরিত্র বলতে কেবলমাত্র সিরাজ-উদ-দৌলা ও মহারাজা নন্দকুমারকে পাবেন। যদি হেস্টিংস, ফ্রান্সিস ও এলাইজ়া ইম্পের কথা বলতে হয়, তাহলে তো সিরাজের কলকাতা আক্রমণ, অন্ধকূপ এবং মহারাজা নন্দকুমার প্রসঙ্গ আসবেই। তবে হ্যাঁ, এই বইয়ে পলাশির যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়নি। ১৭৫৬ সালে অন্ধকূপের ঘটনার আলোচনার পরে ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭৪ অবধি জুনিয়াসরূপী ফিলিপ ফ্রান্সিসের চিঠিপত্রের আলোচনাকে সামান্য ছুঁয়ে ১৭৭৪ সালে ফ্রান্সিসের ভারতে আগমন থেকে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে, সেই আলোচনা শেষ হয়েছে ১৮৩৫ সালে প্রিন্সেস টালেরাঁর মৃত্যু দিয়ে। এর মধ্যেই বাস্টিডের সুললিত লেখনীর মাধ্যমে পাঠক উঁকি মারতে পারবেন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অভিজাতদের বাড়ির অন্দরমহলে, যেখানে একটু কান পাতলেই ফিসফিস করে শোনা যায় নানা কুকীর্তি ও কুৎসা। তার সিংহভাগ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন এই বইয়ে। সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। বান্ধবীর মৃত্যুতে কোনো কবি কাব্য লিখে জনপ্রিয় হয়, আবার কোনো পত্রিকার সম্পাদক চটুল রসিকতা করতে গিয়ে রাজরোষে পড়ে— এই সব কথাই দু'মলাট বন্দি হয়েছে এই বইয়ে।

এই বইয়ে যখন পাঠক দেখবেন, লেখক কোথাও 'এখন' বা 'বর্তমান' বলে কোনো সময়কে উল্লেখ করছেন, জানবেন, সেটি ১৮৭০-৮০'র দশকের কথা বলা হচ্ছে। কোথাও বর্তমান সময়, অর্থাৎ একবিংশ শতকের কথা বলা হলে তা হয় টীকায়, বা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছি। তবে এই বর্তমান সময়ের উল্লেখ খুব প্রয়োজন ছাড়া করা হয়নি। বাস্টিডের কথনশৈলী এতটাই সুললিত যে, পাঠককে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে না, তিনি একবিংশ শতকে বসে অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের মঞ্চে অভিনীত নানা ঘটনার কথা পড়ছেন।

এই বই লেখার সময়ে বাস্টিড বহু লেখক, নানা জনপ্রিয় কবি, নাট্যকারের লেখা উদ্ধৃত করেছেন— কখনও উইলিয়াম কাউপার, কখনও লর্ড বায়রন, কখনও শেক্সপিয়র। আবার জেমস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' সংক্রান্ত অধ্যায়ে তো সেই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু হাস্যকর কবিতা ও প্রহসনও তুলে ধরেছেন তিনি। কখনও উঠে এসেছে কিছু কবরের ফলকে লেখা এপিটাফও। এর মধ্যে বিশেষ করে কাব্যাংশগুলির ক্ষেত্রে মূল লেখাটিই এই অনুবাদে রাখা হয়েছে। তবে তার

সঙ্গে কিছু কবিতার অনুবাদও মূল ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে করার চেষ্টা হয়েছে। কিছু কবিতা বা এপিটাফের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। প্রহসনমূলক গানগুলির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তবে, তাতে পাঠে কোনো বাধা পড়বে বলে মনে হয় না। এই দূরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে অনুজপ্রতিম শুভদীপ ব্যানার্জী। এ-ছাড়া, মাদাম গ্র্যান্ডের মতো যথার্থই 'গ্র্যান্ড' অধ্যায়ে বহু ফরাসি ভাষায় লেখা চিঠি অনুবাদের পর ক্রসচেকিংয়েও বিপুল সাহায্য করেছে ভাইটি। শুভদীপ ছাড়া এই বইটি সম্পূর্ণ হত না। তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা নিয়ে অনুবাদের কাজ করার প্রস্তাব আসার পরে এই বইয়ের কথা বলেছিল গৌরবদা (বিশ্বাস)। এমন একটা বই সাজেস্ট করার জন্য গৌরবদাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সুমনদা (সরকার) এই বইয়ের বর্ণশুদ্ধির সময়ে বড্ড পরিশ্রম করেছে। সে কাজ শুরু করা ইস্তক যথারীতি আমার তরফ থেকে বিপুল জ্বালাতন হাসিমুখে সহ্য করেছে। সুমনদাকেও অনেক ধন্যবাদ।

সবচেয়ে বড়ো ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার প্রকাশক চিরঞ্জীৎ দাসের। এই প্রোজেক্টটা নিয়ে অনেকটা সময় ব্যয় করেছি। প্রকাশক অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেছেন এই বইয়ের জন্য। আশা করি, প্রকাশকের অপেক্ষা এবং আমারও বিপুল সময় ব্যয় বৃথা যাবে না— পাঠক সমাদরে এই বইকে গ্রহণ করবেন।

দীপ্তজিৎ মিশ্র
জানুয়ারি, ২০২৪
হাওড়া

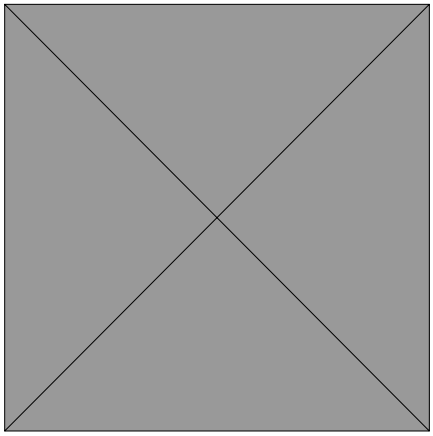

এ তে যা আ ছে

অন্ধকূপ, ১৭৫৬

অধ্যায় ১	কলিকাতা অধিগ্রহণ	২৭
অধ্যায় ২	বন্দিত্ব	৬১

ফিলিপ ফ্রান্সিস ও তাঁর সময়কাল

অধ্যায় ৩	জুনিয়াস হিসেবে ফ্রান্সিস	১০১
অধ্যায় ৪	ফ্রান্সিসের কলকাতায় আগমন	১০৯
অধ্যায় ৫	নন্দকুমার (১৭৭৫)	১১৮
অধ্যায় ৬	দ্বন্দ্বযুদ্ধ— ফ্রান্সিস বনাম হেস্টিংস, ১৭৮০	১৫৯
অধ্যায় ৭	সমাজ জীবন (১৭৭৪-১৭৮০)	১৭৬
অধ্যায় ৮	প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্ম ও মৃত্যু (১৭৮০-১৭৮২)	২৫৮
অধ্যায় ৯	মাদাম গ্র্যান্ড, ১৭৭৭—১৭৮২	৩০৬
অধ্যায় ১০	স্ত্রীকে লেখা ওয়ারেন হেস্টিংসের চিঠিপত্র	৪২৩
অধ্যায় ১১	সেকালের কলিকাতার কবরখানা	৪৮৫

পরিশিষ্ট

১ হ্যামিলটন প্রথা ৫০৫

২ নব্য হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত লেখা ৫০৯

৩ অন্ধকূপের স্থান সম্পর্কে কিছু কথা ৫১৪

৪ নন্দকুমারের বিচারের বিষয়ে হেস্টিংস ও ইম্পে ৫২৫

৫ হেস্টিংস ও ইমহফরা ৫৩৮

৬ এক নবাবের চক্রান্ত ৫৪৭

৭ প্রিন্সেস টালেরাঁ ৫৫৩

৮ চুনারযাত্রা ৫৫৭

অন্ধকূপ, ১৭৫৬

অধ্যায় ১
কলিকাতা অধিগ্রহণ

হালের কিছু বছরে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত লেখালিখি বেশ প্রচলিত হয়েছে এবং তা এখনও চলছে। তার মধ্যে থেকে যা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তা হল ভ্রমণকারীর চোখে ভারতবর্ষ— আসল ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের প্রতি দৃকপাত, ইত্যাদি, প্রভৃতি।

গাইড-বই, পুস্তিকা, স্মৃতিকথা, চিঠি— কোথাও কোনো প্রতারণার ব্যাপার নেই। সবশেষে বলা যায়, ইতিহাসের পুরোনো দলিল ঘেঁটে, নানা সরকারি কাগজপত্র খুঁড়ে দক্ষ এবং পরিশ্রমী মানুষরা নানা তথ্য বের করে এনেছেন। লঘুপাচ্য হোক বা গুরুপাচ্য, এইসব বইয়ের পাঠকরা এগুলির প্রতি আকর্ষিত হন, এর তথ্য থেকে উপকৃত হন। এই গ্রন্থগুলির লেখকদের নিশ্চয়ই সুচিন্তিতভাবে, সযত্নে এই বই লিখতে হয়েছে। আর এইসবের ফলাফল কী? এর জন্য কি ভারতবর্ষ ও তার দারুণ মানুষরা, তাদের ভালোর জন্য সেই দেশে গিয়ে পড়ে থাকা মানুষরা কি ইংল্যান্ডস্থিত ইংরেজ ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণের জ্ঞান বা কৌতূহলের আওতায় এসেছে? আমার তা মনে হয় না। ঐতিহাসিক ব্যাপার হতে পারে, সে-রকম কোনো ঘটনা ঘটলে, সেখানে নানা যুবরাজ, রাজারা উপস্থিত থাকলে, বা আমাদের রাজপরিবারের এক বা একাধিক সদস্য উপস্থিত থাকলে, সেনাবাহিনী হাজির থাকলে তখন আমাদের কাগজগুলি সাময়িকভাবে সে-ব্যাপারে উন্মুখ হয়ে ওঠে। 'আমাদের সর্বোচ্চ নির্ভরশীলতা' বা 'মুকুটের উজ্জ্বলতম হিরে'-র মতো শিরোনামে খবরের কাগজের লেখাগুলি পড়লে মানুষ একটু আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু, রাস্তার সাধারণ মানুষদের কাছে ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আরও জানার কোনো সুপ্ত ইচ্ছাও তার মনের মধ্যে থাকে না। সমাজের সকল স্তরেই এই পরিস্থিতি— নিম্ন, উচ্চ, মধ্য। যে-সব পেশার জন্য শিক্ষা লাগে, সে-রকম পেশার সঙ্গে যুক্ত যে কোনো মানুষকে গ্রেট ব্রিটেনের অন্যতম ভরসার জায়গা এই প্রাচ্যদেশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন; যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত না থেকে থাকেন, তাহলে বেশ

বুঝতে পারবেন, যে-ব্যাপারে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই, সে-ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই।

বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যখন ক্লাইভের উদ্দেশে মেকলে চিঠি লিখছেন, তখনও এ-কথা সত্য। এই গতিময় যুগে বেশিরভাগ ইংরেজ পাঠকের কাছে এমন 'বিস্বাদ' কাহিনি আগ্রহজনক হয় না। 'কীভাবে আমাদের দেশের হাতেগোনা কিছু মানুষ এক সুবিশাল সমুদ্র পেরিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সাম্রাজ্য বানাল'— সে বিষয়টা তাদের কাছে আলুনি ঠেকে।

মেকলের মতে, ভারতীয় বিষয়ের ইতিহাসেই এই ব্যাপারটা ঘটে। দীর্ঘকাল আগে জনসন যে প্রতিবন্ধকটির কথা বলেছিলেন, সে-কথা তিনিও বলেন, এসবের জন্য একটাই জিনিস দায়ী— ব্যাপারটা অতন্ত ক্লান্তিকর। তিনি ওর্মের উদাহরণ দেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন (মি. মরিসন যেমনটা তাঁর জীবনীতে বলেছেন), যে বইয়ে একই সঙ্গে শিল্প, বাকপটুতা ও পরিশ্রম থাকে— তা কী করে ক্লান্তিকর হতে পারে? ওয়ালপোলের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পাঠকের মনে কৌতূহল জাগানো, তাদের লেখার সঙ্গে টেনে রাখার গুণ কল্পকাহিনি-লেখকের মতো ঐতিহাসিক বা প্রাবন্ধিকের ক্ষেত্রেও জরুরি। কিন্তু সে-সবের কথা খেয়াল রেখেও, এই বিংশ শতকে দাঁড়িয়ে খুব বিশেষ কারণ ছাড়া গড়পড়তা পাঠক বা ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের কাছে ভারতবর্ষ খুবই ক্লান্তিকর বিষয়। আমার ধারণা, আমাদের দেশের মানুষকে কর্মসূত্রে ভারতবর্ষে পাঠানো হলে তা তাঁরা নির্বাসনের শামিল বলে মনে করেন। সে-জন্য তাঁদের মধ্যে এই দেশ সম্পর্কে যতখানি আগ্রহ গড়ে ওঠার কথা, তার চেয়ে কম আগ্রহই গড়ে ওঠে। বিশেষ করে প্রাচীন দিনের ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে। যদি তা-ই হয়, তবে এ-কথা বাণিজ্যিক ও বিভাগীয় কাজের গরিষ্ঠ অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যস্ত বর্তমানের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় ডুবে যেতে-যেতে অতীত খোঁড়ার সময় তাঁদের নেই বললেই চলে। সে-জন্য, বর্তমান প্রজন্ম একই স্থানের ইতিহাসের ব্যাপারে কিচ্ছুটি না জেনে, তার পরোয়াও না করে এগিয়ে চলে।

তা সত্ত্বেও, যাঁরা দৈনিক কাজের চাপে, দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত; আধুনিক রাজনীতি, সাহিত্য ও যুদ্ধের ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরা এই অতীতের জগতে সামান্য শান্তি খুঁজে পেতে পারেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরা ভারতে নির্বাসিত হয়ে কীভাবে বিভাগীয় কাজকারবার সামলাতেন, দৈনন্দিন জীবন কাটাতেন, তা জানতে পারবেন। এমন এক অতীতের স্মৃতিচারণ, যা কিনা কোনোভাবেই ক্লান্তিকর নয়, তা মানুষকে নির্মল আনন্দ দিতে পারে। এমনকি, যাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কাজ করার পেশার সঙ্গে যুক্ত, 'মুহূর্মুহূ বিপ্লব, একই বিস্বাদ আনন্দের পুনরাবৃত্তি' দেখে ক্লান্ত, তাঁরাও এই থেকে আনন্দ পাবেন। কেবল ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষের রাজধানীই অনেকের মনের মধ্যে কৌতূহল

জাগাতে পারে। তাঁদের যেসব জায়গায় স্মৃতি রয়েছে, সেসব জায়গার ইতিহাস, তাঁদের নিজেদের মানুষের ইতিহাস, যে নামগুলি শুনে এর আগে তাঁদের কোনো আগ্রহ জাগেনি, সেসব তাঁরা জানতে পারবেন। কারণ প্রাচীন কলকাতায় উজ্জ্বল হয়ে ক্রমে নিভে যাওয়া মানুষগুলির ব্যাপারে কেউই বিশেষ কিছু জানে না।

২০ জুন (যা ভিক্টোরীয় যুগের ক্ষেত্রে এক শুভদিন[১] হবে) তারিখটা ভারতবর্ষের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহরের শৈশবকালে ঘটা এক দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তার জন্য এই শহরের নামে চিরকাল একটা কালো দাগ রয়ে যাবে। এই কালো দাগ এতটাই জনমানসে প্রচারিত হয়েছিল যে 'কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যা' কথাটা ইংরেজি ভাষাভাষি এবং সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

১৭৫৬ সালের কলকাতা অধিকার এবং ফলস্বরূপ সৃষ্ট চরম দুর্ভোগসমূহ সম্পর্কে বেশিরভাগ পাঠকই কমবেশি জানেন। শুধু তা-ই নয়, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে তো ঘটনাগুলি একেবারেই সুপরিচিত। কিন্তু, যাঁরা নিজেদের ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকেও এই ঘটনাবলি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য আর একবার সংক্ষেপে বলা যেতেই পারে। এই বসতি অধিকারের পর তার ক্রমবৃদ্ধির সময় এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা বলা দরকার। এমন বেশ কিছু স্থানের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলা দরকার, যা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সেতুবন্ধন করে। কিছু ব্যক্তিগত কীর্তিগাথায় আলোকপাত করার সময়, কিছু ভুলে যাওয়া চরিত্রদের কথা বলা দরকার যারা মূল ঘটনায় নিজেদের ছাপ রেখে গিয়েছিল, একই সঙ্গে তাদের নাম রক্তাক্ষরে লেখা হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে, খুব ছোটো করে বলে রাখা যায়, হুগলি নদীর পূর্বপাড়ের বসতি ক্রমে তার পরিসরবৃদ্ধি, জনসমাগম এবং ব্যবসায়িক গুরুত্বের জন্য বিকশিত হচ্ছিল। কোম্পানি ও মুঘল কর্তৃপক্ষের মধ্যে যখন মাদ্রাজ অধিকার নিয়ে ঝগড়া-অশান্তি তুঙ্গে, ততদিনে বাংলায় ইংরেজদের ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলেছে। ১৬৮৮ সালের শেষ দিকে কোম্পানির প্রধান প্রতিনিধি জোব চার্নক ও তাঁর দলবলের ওপর নির্দেশ আসে, দু'বছর তাঁরা কোনোরকম ব্যবসায়িক কাজ করতে পারবেন না। ঔরঙ্গজেব যখন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের জন্য তাঁর কোষাগারের লাভের অঙ্কটা বুঝতে পারলেন, তখন তাঁর অধীনে থাকা বাংলার ভাইসরয় ইব্রাহিম খাঁ-কে ফের ইংরেজদের ফিরিয়ে আনার আমন্ত্রণ জানাতে নির্দেশ দিলেন। চার্নক ব্যাপারটা কিছুটা বিবেচনা করে দেখার পর সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কিছু কেরানি, কর্মচারী ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে 'দ্য বে'-র উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করেন। নদীর ধারে সুতানুটি গ্রাম ছিল বাংলায় ইংরেজদের দেখা শেষ

বসতি। ১৬৯০ সালের আগস্ট মাসে চার্নক সেখানেই ফিরে এলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর লোকজন রীতিমতো তাঁবু ফেলে আশ্রয় নিলেন। কিছু কুটির আর নৌকোতেও আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কারণ, তাঁরা আগে যে বাড়িগুলি পেশার প্রয়োজনে বানিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলি উধাও হয়ে গিয়েছিল।

অভিজ্ঞ দলনেতার নির্দেশে আবার ব্যাবসা শুরু হল। প্রথমেই, একেবারে সাধারণ বাড়ি নির্মাণ শুরু হল। স্থানীয় ক্ষমতার সূত্রদের সন্তুষ্ট করে সকলের ভরসা অর্জন করার জন্য আর্মেনীয় ও অন্যান্য ধনবান ব্যবসায়ীরাও ইংরেজদের দিকে আকৃষ্ট হলেন। ক্রমসাফল্যের জন্য এই বসতি ধীরে-ধীরে নদীর ধার বরাবর দক্ষিণদিকে বাড়তে লাগল। ক্রমে কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামও এই বসতির অংশ হল। এই তিনটি গ্রামের মধ্যে কলকাতা গ্রামটি মাঝে অবস্থিত হওয়ায় সম্ভবত সেখানেই আরও উন্নতমানের বাড়ি নির্মাণের মালপত্র পাঠানো হতে লাগল। তার পাশাপাশি কোম্পানির পণ্য ও অর্থলগ্নির প্রধান কেন্দ্রও হয়ে উঠল সেই গ্রাম। তাই, সেই গ্রামের নামেই গোটা বসতির নাম দেওয়া হল।

কিছু সময় কেটে যেতে যখন আরও কিছু কারখানা গড়ে উঠল, তখন কোম্পানির কর্মচারীরা বুঝতে পারলেন, একটা কেল্লার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাঁরা সেই কেল্লা তৈরি করে তার চারপাশ ঘিরে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় (ঐতিহাসিক ঘটনা শুভা সিং-এর বিদ্রোহ এর সঙ্গে যুক্ত। এর জন্য ইংরেজরা পরোক্ষভাবে উপকৃতই হয়েছিলেন।) এই অনুমতি পেতে আরও সুবিধে হল। ততদিন পর্যন্ত ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষরা কখনও এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি। নির্মীয়মাণ কেল্লার পাঁচিল তোলা শুরু হল। এ-কথা ১৬৯৬ সালের শেষ ভাগের।

এক-দু'বছর বাদে কিছু সুযোগসুবিধা আইনতভাবে হস্তগত হল। তাতে ইংরেজদের অবস্থানের বিশেষ উন্নতি হল। সেই উন্নতির মাত্রা এতখানি যে, ১৬৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস লিখলেন (তাঁদের 'কেল্লা' তখনও নিতান্তই খোলসরূপী হয়ে আছে জেনেও সাড়ম্বরে লেখা): "বর্তমানে এক সুগঠিত কেল্লা ও বিশাল জমির অধিকারী হওয়ায় এবার আমরা বাংলাকে প্রেসিডেন্সি হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং আমাদের প্রতিনিধিকে (স্যার চার্লস আয়ার) ওখানকার প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের কেল্লা ইত্যাদির গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছি। কেল্লাটিকে আমরা ফোর্ট উইলিয়াম বলে ডাকি।" এত ধীরে এবং সাবধানে কেল্লাটি নির্মিত হচ্ছিল যে, স্থাপত্যটিকে সুগঠিত কেল্লা বলার জন্য আরও বিশ বছর সময় লেগে গিয়েছিল।

এই সুদিনের সূত্রপাতটুকু জোব চার্নক দেখে যেতে পেরেছিলেন। নানা অসুবিধে ও বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ইংরেজদের উন্নতিকে স্বাগত জানানোর জন্য

তিনি জীবিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্থাপিত ভিতের ওপরেই তাঁর দেশের মানুষরা এক বিশাল ইমারত খাড়া করেছিল। অবশেষে বিভিন্ন উত্থান-পতন এবং অসুবিধে কাটিয়েও দীর্ঘ সময় ধরে তিনি নিজের দেশের সেবা করা পর তাঁর বিশ্রামের সময় উপস্থিত হল (জানুয়ারি, ১৬৯৩)। কলকাতায় তাঁর সমাধি আজও রয়েছে। হ্যাকলুট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত স্যার উইলিয়াম হেজেসের ডায়রির প্রথম খণ্ডে জন ব্রুসের বক্তব্য উদ্ধৃত করা আছে। তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁর নিয়োগকর্তারা, অর্থাৎ কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের সদস্যরা চার্নকের কাজে খুবই খুশি ছিলেন। তাঁরা সেন্ট জর্জ কেল্লার উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "মি. চার্নককে কাশিমবাজারের প্রধান করার প্রস্তাবে না বলার বদলে তাঁরা তাঁদের বাকি সব এজেন্টদের বরখাস্ত করা শ্রেয় মনে করবেন।"

তার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ব্যাবসা ফুলেফেঁপে উঠল। কোম্পানির এজেন্টরা ইংল্যান্ডে বসে থাকা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের কাছে মোটা অঙ্কের লভ্যাংশ পাঠাতে পারছিলেন। তা ছাড়া, তাঁদের নিজেদের অর্থভাণ্ডারও ক্রমে বেড়ে উঠছিল। তা ছাড়া, স্থানীয় শাসকদের অনির্বাণ অর্থতৃষ্ণাও তাঁরা মেটাতে কিছুটা হলেও সফল হচ্ছিলেন। বাংলার প্রত্যেক ভাইসরয় তাঁর পূর্বতনের থেকে অধিকতর অত্যাচারী হয়ে উঠছিলেন আর তাঁদের মন্ত্রীরা হয়ে উঠছিলেন অর্থলোলুপ। যখনই মুর্শিদাবাদ বা দিল্লির দরবার থেকে অর্থের প্রয়োজনীয়তা জানানো হচ্ছিল, তাঁদের সটান অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কোম্পানির ব্যাবসায় বাধা পড়ছে, বা অর্থলগ্নিতে বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে— এহেন অজুহাত সবসময় তৈরিই ছিল। যতক্ষণ না তারা ভাইসরয়ের অনুকম্পা মেনে নিয়ে ক্ষান্ত দিত, ততক্ষণ এই ধরনের অত্যাচার চলত। সামান্যতম প্রতিবাদ করা হলে তাদের নির্লজ্জের মতো অপমানিত করা হত, কিন্তু এই পন্থা ছিল তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত এবং সাশ্রয়ী। একবার কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোল— সে কেউটে মরিয়া হয়ে ভাইসরয়ের ওপর দিয়ে গিয়ে সোজাসুজি দিল্লির সম্রাটের কাছে দরবার করল। কোম্পানির তরফ থেকে একটি দলকে (বলাই বাহুল্য, বিপুল উপহার দিয়ে) পাঠানো হল মহান মুঘলের কাছে, এটাই নাম ছিল তাঁর। উদ্দেশ্য— তাঁদের অভিযোগ জানানো এবং প্রতিকার পাওয়া। টানা দু' বছর ধরে বিপুল পরিমাণে ঘুষ দেওয়ার উদ্যোগ সফল হল (১৭১৭), সম্রাটের তরফ থেকে ফরমান মিলল বসতি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য[২]। এই সুযোগসুবিধার মধ্যে বেশ কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা ছিল, যাতে করে ব্যাবসা করা আরও সহজ হয়ে গেল। এতে করে এই ঔপনিবেশিকদের সুরক্ষা ও আইনের অধীনে এ-দেশে আসা বিদেশিদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। 'ইস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ব্যাবসারত সম্মিলিত ব্যবসায়ী সমিতি'-র সাফল্য এর পর এক উন্নত এবং লাভজনক মোড় নিল (তার মধ্যে মাঝেমধ্যেই 'নবাবকে তুষ্ট রাখা'-র প্রয়োজন হয়ে পড়ত; তাঁকে পাঠানো নানা ভেট এবং অন্যান্য উপহারের

ব্যাপারে ইনিয়ে-বিনিয়ে বহু কথা বলা হয়েছে)। অবশেষে সেই নির্দিষ্ট সময়টা এল, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।

১৭৫৬ সালের মধ্যে কলকাতা শিল্পের উন্নতির দিক থেকে এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শোনা যায়, বাৎসরিক ব্যাবসার অঙ্ক দশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। বছরে আন্দাজ পঞ্চাশখানা জাহাজ এসে ভিড়ত বন্দরে। উত্তর থেকে দক্ষিণে নদীর ধার বরাবর ক্রমে এলাকাবৃদ্ধি ঘটছিল (ধরে নেওয়া যাক, চিৎপুর ব্রিজ থেকে বর্তমান দুর্গের দৃষ্টিপথ অবধি)। এই দুই সীমার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল ছোটো দুর্গ। দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় আধ মাইল জায়গা জুড়ে ইংরেজরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করছিল। তা ছাড়া, দুর্গের সোয়া মাইল পূর্ব অবধিও তাদের বসতি দেখা যেত। ইংরেজদের বাসস্থানের সীমানা পেরোলে স্থানীয় মানুষদের ঘিঞ্জি বাড়ি ও কুঁড়েঘর দেখা যেত। তাদের মধ্যে 'কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-সহ একটু উন্নত স্তরের লোকরা উত্তরভাগে থাকত; আর তাদের তুলনায় কম সংগতিসম্পন্ন মানুষরা দক্ষিণ ও পূর্বদিকের বাজারে থাকত।

এই স্থানীয় মানুষদের থাকার জায়গাকে বলা হত 'ব্ল্যাক টাউন', বা 'কালো শহর'। সেই এলাকা প্রায় চার মাইল অবধি বিস্তৃত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৭৫২ সালে কলকাতার ইউরোপীয় কালেক্টর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি হিসেব করে দেখেছেন, কোম্পানির এলাকার মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয়দের সংখ্যা আনুমানিক ৪০০,০০০-এরও বেশি। তা-ও "প্রতিদিন যাতায়াত করা লোকদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র যারা পাকাপাকিভাবে এখানে বাস করছে, তাদের আদমশুমারি করে।"[৩]

১৭৪২ সালে মারাঠা বর্গিদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য নদীর পূর্বদিকে প্রায় এক মাইল দূরে একটা পরিখা কাটা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, উত্তর থেকে দক্ষিণে কোম্পানির সীমানা বরাবর এই পরিখা কাটা হবে। কিন্তু যে বিপদের আশঙ্কায় এই সাবধানতা গ্রহণ করা, তা কেটে যেতে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আন্দাজ তিন মাইল মতো এই পরিখা কাটা হয়েছিল; দক্ষিণভাগের পরিখা কাটার ব্যবস্থাপনা শুরুই হয়নি। এই জায়গা পরিচিত ছিল 'মারহাট্টা ডিচ' বা 'মারাঠা খাত' নামে।

এই পরিসীমার সঙ্গে যোগ হয়েছিল একটা ঘন জঙ্গল, বায়ুর উজানে অবস্থিত এক অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি, আর এক প্রবহমান নদী। আমরা পরে দেখব, প্রবল মৃত্যুহারের পাশাপাশি ইউরোপীয় জনসংখ্যা কত ছিল। সেই ভুলে যাওয়া অগ্রগামীরা সেই সাংঘাতিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কীভাবে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা আধুনিক কলকাতার মানুষদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাদের কর্মক্ষেত্রের কাছের কবরখানায় উঁকি মারলে সেই পরিস্থিতির কিছুটা আঁচ পাওয়া সম্ভব।